বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় অগ্রাধিকার খাত নির্ধারণ প্রয়োজন

আবু ইউসুফ মো. আব্দুল্লাহ

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ধারাবাহিক ক্ষয়িষ্ণু রাজনীতি, সন্ত্রাস, সেশনজটের অভিশাপ, ক্রমবর্ধমান উচ্চশিক্ষা প্রত্যাশীদের স্থান সংকুলানে ব্যর্থতা, ভাল এবং কৃতী শিক্ষার্থীদের বিদেশে পড়াশোনা করতে যাওয়ার প্রবণতা এবং এসব কারণে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার মজুতের ওপর বিরূপ প্রভাবের সূত্র ধরে বাংলাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণার উৎপত্তি। উচ্চশিক্ষার চাহিদা মেটাতে অল্প সময়ের ব্যবধানেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনেক সফলতা অর্জন করেছে। অবশ্য পাশাপাশি এর কিছু ব্যর্থতাও রয়েছে যা অত্যন্ত স্বাভাবিক। বেসরকারি পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার চাহিদা মেটানোর এ সীমাহীন সম্ভাবনাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সময় এসেছে। বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সর্বোচ্চ সাংবিধানিক আইনগত প্রতিষ্ঠান "বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন" কর্তৃক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় অগ্রাধিকার খাত চিহ্নিতকরণ এবং এ লক্ষ্যে এ যাবৎ গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পুনর্বিবেচনা করা আজ সময়ের দাবি। একবিংশ শতাব্দীর পরিবর্তিত পরিস্থিতি বিষয়টাকে আরও গুরুতর করে তুলেছে।

মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে প্রথম পদক্ষেপ ছিল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাময়িক অনুমোদন। সাময়িক অনুমোদনপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে একটি স্বল্পমাত্রার সময়সীমাও বেঁধে দেয়া হয় এই মর্মে যে, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে তাদেরকে স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ করতে হবে। এজন্য ঢাকায় এক একর, চট্টগ্রামে দুই একর এবং দেশের অন্যান্য এলাকায় পাঁচ একরবিশিষ্ট জায়গায় স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ করতে হবে। তারা এ বিষয়ে লক্ষ্য অর্জনের সফলতা-ব্যর্থতার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সবুজ, হলুদ ও লাল রঙেও চিহ্নিত করেছে। শুধুমাত্র পাঁচ বছর সময়সীমা বেঁধে দেয়া এবং সবুজ, হলুদ ও লাল রঙে চিহ্নিতকরণই নয় বরং এ লক্ষ্য অর্জন তথা ৫ বছরের মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণে ব্যর্থ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি বন্ধ করে দেয়ার হুমকিও দিয়েছে মঞ্জুরি কমিশন। বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ই খুবই যুক্তিসঙ্গত কারণে এ শর্ত পূরণ করতে পারেনি। কেননা একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণে মাত্র ৫ বছর সময়, এ নিতান্তই নগণ্য। এতো অল্প সময়ে একটা স্কুলের সত্যিকার অবকাঠামো নির্মাণই যেখানে কঠিন ব্যাপার। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় হাজার বছর টিকে থাকার জন্য। এগুলোর ধ্বংস নেই। আজকের বিশ্বের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শতশত বছর সময় লেগেছে বর্তমান পর্যায়ে আসতে। বাংলাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের জীবনচক্রে অনেকটা শিশুর মতো। এদের প্রাপ্তবয়স্ক মনে করা এবং এদের ঘাড়ে প্রাপ্তবয়স্কের দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া বিশাল বড় ভুল। স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণের জন্য মাত্র ৫ বছরের অতি সংক্ষিপ্ত একটি সময়সীমা বেঁধে দেয়ার কোনো অর্থ হয় না।

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেবর চিন্তা করে সে অনুযায়ী স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ এবং সেখানে স্থানান্তরের বিষয়টি কম করে হলেও ৪০০ থেকে ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের ব্যাপার। কিন্তু এ টাকাটা আসবে কোত্থেকে? বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ অনুসারে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আয়ের উৎস হচ্ছে জনহিতৈষী ব্যক্তি, সংঘ বা দাতাপ্রতিষ্ঠানের অনুদান, ঋণ এবং সরকার বা অন্য কোনো অর্থনৈতিক সংস্থার ঋণ, ছাত্রদের বেতন, অভ্যন্তরীণ আয় এবং মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোনো উৎস। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো এই, এখানে কেউ দান-সদকা করতে আসে না এবং ছাত্রদের বেতন ছাড়া এখানে কোন প্রত্যক্ষ আয় নেই। ফলে যে কোনো উন্নয়নের কাজে হাত দিতে হলে ঋণ ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। একটা শিশু প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ৫০০ কোটি টাকার ঋণ বহন করা অত্যন্ত দুরূহ এবং অবাস্তব। পরিতাপের বিষয় হলো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়ের কথা যখন আসে, তখন ছাত্রদেরই এর ব্যয়ভার বহন করতে হয়। সরকার যেখানে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে প্রায় বিনামূল্যে শিক্ষা দেয়ার জন্য ছাত্র-ছাত্রী প্রতি লাখ-লাখ টাকা খরচ করছে শুধু তাই নয় সরকার নিজের টাকা দিয়েই এসব বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলোর স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করে দিচ্ছে। সেক্ষেত্রে স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর ওপর খরচের অতিরিক্ত দায়ভার চাপানো বেশ বেদনাদায়ক; যেখানে নিজেদের পড়াশোনার নিয়মিত খরচ জোগাতেই ছাত্র-ছাত্রীরা হিমশিম খাচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বিভিন্ন একাডেমিক প্রোগ্রামে পরিচালিত কারিকুলাম ও সিলেবাসের গুণগতমান নিয়ে কথা বলে না। দেশে অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তাও করে না। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ধারা অনুযায়ী এ কাজটিই তাদের করার কথা। অথচ এদিকে তাদের কোন মনোযোগ নেই। শ্রেণিকক্ষে প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তি ও স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার দিকে তাদের নজর পড়ে না। বিদেশ থেকে নতুন নতুন ধারণার আমদানি এবং তা আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কিভাবে বাস্তবায়ন করা যায় এনিয়েও তাদের মাথাব্যথা নেই। তাদের মাথাব্যথা শুধু বিল্ডিং তথা ক্যাম্পাস নিয়ে। জাতি শুধু মাঝে মাঝে তাদের সতর্কবাণী শোনে যে, এ ক্যাম্পাসে নয়, ছাত্ররা ঐ ক্যাম্পাসে ভর্তি হতে পারবে। তারা কখনই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অভ্যন্তরীণ কাঠামোর গুণগতমানও পরখ করে দেখেন না। উচ্চশিক্ষা প্রদানে একটি জাতির পিছিয়ে পড়া জন্য এগুলো হচ্ছে খুব দুঃখজনক লক্ষণ।

আমাদের দেশ একটি জাতি হিসেবে যদি মনে করে যে সকল আলোচ্যসূচির মাঝে প্রধান আলোচ্য বিষয় হবে শিক্ষা, তারা যদি বিশ্বাস করে যে শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড, তারা যদি মনে করে যে সমগ্র জাতির উন্নয়নের জন্য স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা-বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ভূমিকা আছে, তারা যদি উপলব্ধি করে যে দেশের ভবিষ্যৎ কর্মশক্তি অবশ্যই শিক্ষিত ও দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে, তাহলে সময় এসেছে উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো নিয়ে একযোগে কাজ করার। এখানে সরকারি-বেসরকারি বলে দ্বিধাবিভক্তির কোন সুযোগ নেই। আর এ বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করতে হবে বহিরাগতের মতো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর স্বেচ্ছাচারী নিয়ম-কানুন আরোপ করার মাধ্যমে নয়, বরং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভেতরের একজন হয়ে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর সমকালীন বাস্তবতাকে মাথায় রেখে তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সমাধান করার মাধ্যমে। সরকার ও মঞ্জুরি কমিশন যদি দেশের উচ্চশিক্ষা খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিজেদের প্রতিষ্ঠান মনে করে এর মালিকানা দাবি করতে পারে এবং সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর সমাধান অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করতে পারে তাহলেই না আমাদের প্রিয় জাতির ভাগ্যে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটবে।

● লেখক : অধ্যাপক, আই.বি.এ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়